রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-ভাবনা ও তিন কন্যা সম্প্রদান

সাদ কামালী

❀ ——————

চন্দ্রনাথ বসু একজন ভাবুক জ্ঞানবান পণ্ডিত মানুষ। তাঁর 'শকুন্তলা' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয়' পেয়েছিলেন। এই পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বসু 'হিন্দুপত্নী' এবং 'হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামে দু'টি আলোচিত প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে হিন্দুবিবাহের 'আধ্যাত্মিকতা', 'হিন্দুদম্পতির একীকরণতা' এবং 'বাল্যবিবাহ' সম্বন্ধে তিনি প্রথা শাস্ত্র ও ধর্মমতের সঙ্গে একমত হয়েও নিজের মত বিস্তৃতভাব লেখেন। তখন কয়েকটি 'কাগজেও অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত' হতে থাকে শ্রী চন্দ্রনাথ বসুর মত। 'খ্যাতনামা গুণী ও গুণজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত' অক্ষয়কুমার সরকারও উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর প্রশংসা ও কিছু সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন। মানুষের শরীর, মন ও সমাজের মঙ্গল সম্পর্কিত প্রায় সব বিষয়েই অত্যন্ত সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথ যেমন বরাবর নিজের মত পরিষ্কার করে প্রকাশ করেন, এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। সময়টা বাংলা ১২৯৪ সন, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন হলে রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধ দু'টি অবলম্বন করে হিন্দুবিবাহ, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দ্রনাথ বাবুর ধর্ম, শাস্ত্র প্রথা সমর্থিত মতের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, যুক্তি, যুগের প্রয়োজন ও কল্যাণ বিবেচনা সাপেক্ষে নিজের মত 'হিন্দুবিবাহ' নামক প্রবন্ধে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। কালের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের ওই মত ছিল সাহসী ও অগ্রবর্তী। 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহভাবনা ও তিন কন্যা সম্প্রদান' প্রবন্ধের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুবিবাহ' থেকে প্রয়োজনীয় মতটুকু যাচাই করে দেখা হবে , সামগ্রীকভাবে হিন্দুবিবাহ বিষয়ে চন্দ্রনাথ বাবুর মতের পক্ষে সামাজিক সাড়া রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে হিন্দুবিবাহ বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করায়। 'বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য' কেউ কেউ এবং 'সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র' কোন কোন পণ্ডিতবর্গও যখন হিন্দুবিবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথেরও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ঘটে, কারণ তাঁদের আলোচনায় শাস্ত্রসম্মত ঐতিহাসিকতা বা বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতার বিষয়ে বড়ো-একটা-কিছু বলেন নাই, 'কেবল সূক্ষ্মযুক্তি ও কবিত্বময় ভাষা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে হিন্দুবিবাহের বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে—ইহার মধ্যে কোন্ সময়ের বিবাহকে যে তাঁহারা হিন্দুবিবাহ বলেন তাহা ভালোরূপ নির্দেশ করেন নাই। যদি বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলেন, তবে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কেন। ... সেকালের শাস্ত্রোক্তি এখন প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে চোখে ধুলা দেওয়া হয়। হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি কেহ বৈদিক বচন উদ্ধৃত করেন তাহার জানা উচিত যে, বৈদিক কালে স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য অবস্থা আমাদের বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। যিনি হিন্দুবিবাহের পক্ষে পুরাণ ইতিহাস উদ্ধৃত করেন, তিনি এক মহাভারত সমস্ত পড়িয়া দেখিলে অকূল সমুদ্রে পড়িবেন। মহাভারতের নানা কাহিনীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিশৃঙ্খলা বর্ণিত হইয়াছে , ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে তাহার ভালোরূপ সমালোচনা ও কালাকাল নির্ণয় না করিয়া কোনো কথা বলা উচিত হয় না। যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। ... মনুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষার ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা' (হিন্দুবিবাহ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী বৈশাখ ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৬৫৭)। সমাজ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে কালের প্রয়োজন সাপেক্ষে শাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিবেচনা করে হিন্দুবিবাহের নিয়মাবলী ঠিক করার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ। শাস্ত্রের প্রাচীন সম্পূর্ণ অনুসরণের বিপক্ষে তিনি, চন্দ্রনাথ বাবু যখন প্রাচীন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলেন, 'প্রাচীন সমাজে স্ত্রীলোকের সবিশেষ সসম্মান ছিল' (ঐ, পৃষ্ঠা ৬৫৯) তখন রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান 'শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অসম্মানেরও প্রমাণ আছে' (ঐ)। তিনি বলেন, 'মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়' (ঐ)। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সংহিতার নবম অধ্যায়ের চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশের শ্লোক পাঠ করে দেখতে বলেন, এবং হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে তিনি কিছু নজির হিসেবে পেশও করেন। শুধু সংহিতা নয়, মহাভারতের স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মদেবের স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে তুমুল নিন্দার উল্লেখ করে বলেন, 'বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে' (ঐ)। কিন্তু পণ্ডিতবর্গ, বিশেষ করে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষের ধর্মপ্রণালী' প্রবন্ধে যখন বলেন, 'মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, সমাজই সে-সকলের কেন্দ্রস্থান, সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া সেই সকল ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।' সমাজের মঙ্গল প্রশ্নে হিন্দুবিবাহের বিষয়ে তখন রবীন্দ্রনাথের মত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে, 'সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হইয়াছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্তমান সমাজে বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক নয় কি না তাহা সমালোচ্য' (ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭৭)।

বয়সের সীমা সম্পর্কে মনু যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, চন্দ্রনাথ বাবু তার পক্ষে প্রবল ওকালতি করলেও রবীন্দ্রনাথ একমত হতে পারেন না। পুরুষের ২৪ হতে ৩০-এর মধ্যে বয়স-সীমা তিনি মেনে নিলেও যৌবনপূর্ব ৮ হতে ১২-র মধ্যে বালিকাবিবাহর তীব্র সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। দাঁত ওঠা মাত্র খুব শক্ত জিনিস খেতে দেওয়া দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো নয়, তেমনই যৌবন সঞ্চার হওয়ামাত্র স্ত্রী-পুরুষ সন্তান জন্মদানে যোগ্য হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের মত ও সমাজের মঙ্গলচিন্তা করে বলেন, 'ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মান্য ব্যক্তিগণ কারণ দর্শাইয়া

বলিয়া থাকেন যে, যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপত্যোৎপাদন স্ত্রী, পুরুষ এবং সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিজনক' (ঐ, ৬৬৭)। বিজ্ঞানের মতই রবীন্দ্রনাথের মত। বলেন, 'বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কথায় যদি কর্ণপাত না করি তবে সত্য সম্বন্ধে কিছু কিনারা করা দুর্ঘট' (ঐ)। হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধ পাঠ সভার সভাপতি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ও বিজ্ঞানের মতে আস্থা রেখে বক্তব্য দেন। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সভাপতির মতের প্রতিধ্বনি করেন। এই বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত অক্ষয়বাবুকে উদ্ধৃত করেন,—'আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালকবিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করি। করিলে বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই সে বিধবা হইয়াছে এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না। ... যিনি যেরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন কন্যার বয়সও বাড়াইতেই হইবে।' 'কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ অন্যায়' অক্ষয়বাবুর এই মতের মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, তবে তিনি অক্ষয়বাবুর 'কার্যত প্রতিবাদ' বা 'প্রতিরোধ'-এর কথা বলেন না, বলেন ভিন্নভাবে কিছুটা নিম্নস্বরে—সভাসমিতি করে কাগজে লিখে বা বলপূর্বক বাল্যবিবাহ উঠানো যাবে না, তিনি মনে করেন, 'যাঁহারা আইন করিয়া জবরদস্তি করিয়া এই প্রথা উঠাইতে চান, তাঁহারা এ প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া দুই একটি ফলাফলমাত্র বিচার করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁহারা দেখেন নাই। সামাজিক অন্যান্য সহকারী-নিয়মের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহ বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে' (ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭৭)। আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হলে কি উপায়ে সমাজে 'সমূহ দুর্নীতি', 'সমাজের সমূহ অনিষ্ট' ও 'বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব' হবে সে-বিষয়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গের মতো ব্যাখ্যা করেননি। শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে যুগের উপযোগিতা সূত্রে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের বহু পূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যবিবাহের পক্ষের যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'দুর্নীতি' বিশৃঙ্খলার যুক্তি খণ্ডন করেই 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে অবিলম্বে এই অনুচিত বিয়ে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যপরিণয় প্রথার অবর্তমানে 'বালকবালিকাদের দুষ্কর্মাসক্ত' হবার সম্ভাবনা যদি ঘটে তা থেকে উদ্ধারের পথ পরিষ্কার বুঝিয়ে দেন, 'যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্মাধর্মে ও সদসৎ কর্মে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য বৃদ্ধি হয়' (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৬৮৪)। চন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ সম্পর্কিত মতের সমালোচনায় অনেক পণ্ডিতবর্গের মত উদ্ধৃত করলেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে কখনো স্মরণ করেন না। যদিও রবীন্দ্রনাথের হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধের অধিকাংশ সুচিন্তিত মতের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরেরও মিল রয়েছে। হয়তো এজন্য যে, বিদ্যাসাগর প্রচলিত বিবাহনিয়মকে যে দণ্ডে দণ্ডিত করতে চান, রবীন্দ্রনাথ সেখানে সমন্বয় সমঝোতার পথ খোঁজেন। 'অনন্তর সর্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্বপূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ' (ঐ, পৃঃ ৬৮০)। রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ের পথে এমন 'যথার্থ বিবেচনা' বিবেচ্য হয় না।

হিন্দুবিবাহ বাল্যবিবাহ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মতপ্রকাশ হয়েছিল বাংলা ১২৯৪ বা ইংরেজি ১৮৮৭ সনে। রবীন্দ্রনাথ তখন ২৬ বছরের যুবক। তাঁর স্ত্রীর বয়স তখনো ১৪ হয়নি। কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর জন্ম ১৮৭৪-এর ১ মার্চ। হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে মস্ত পণ্ডিত' ডাক্তার কার্পেণ্টার-এর মতো বিশেষজ্ঞের মতের ওপর জোর দিয়ে এবং সাক্ষী মেনে চন্দ্রনাথ বসুর উচিৎ সমালোচনা করেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার-এর মতে ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। 'যৌবনারম্ভে স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয় সকলের বিকাশ লক্ষণ দেখা দিবামাত্র যে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহা কেবল পূর্ববর্তী আয়োজন মাত্র। নরনারী যখন সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটতা লাভ করে হিসাবমতে তখনই তাহারা জাতিরক্ষার জন্য জননশক্তি প্রয়োগ করার অধিকারী' (ডাক্তার কার্পেণ্টার, হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে উদ্ধৃত)। কার্পেণ্টার-এর বক্তব্যে আস্থা রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে মন্তব্য করেন, 'তবে আমাদের দেশে ১০/১১ বৎসর বয়সেও যে যৌবন সঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায় তাহা বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে।' মৃণালিনী দেবীকে তিনি বিয়ে করেন ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ তারিখে, মৃণালিনীর বয়স তখন মাত্র ৯ বছর ৯ মাস ! 'বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল' স্বরূপ মৃণালিনী প্রথম সন্তান কন্যা মাধুরীলতা (বেলা)-র জন্ম দেন মাত্র ১২ বছর ৮ মাস বয়সে, অর্থাৎ ২৫ অক্টোবর ১৮৮৬ তারিখে। ৯ বছরের বালিকাকে বিবাহ এবং ১২ বছরের বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন সম্পন্ন করেও 'চন্দ্রনাথ বাবুর কথা ভালো করিয়া সমালোচনা করা কি শুধু সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন হলের পরিকল্পিত আনুষ্ঠানিক সভানুকূল বক্তব্য ? অক্ষয়বাবুর কার্যকর প্রতিবাদের স্থলে তিনি শিক্ষার প্রভাবের কথা বলেন, তখন রবীন্দ্রসমাজে বা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার অভাব ছিল এমন কথা নিন্দুকেও মুখে তুলবে না। যাই হোক, জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে মাধুরীলতার জন্ম। প্রথম সন্তানের অপূর্ব শ্রীরূপ দেখে নবীন-পিতা কবি রবীন্দ্রনাথ অভাবিত পুলক অনুভব করেন। অদম্য উৎসাহে প্রথম সন্তানের লালন-পালন শিক্ষা তথা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে গড়ে তুলতে কোনো ত্রুটি করেননি , ভগ্নি নিবেদিতার পরামর্শে মাধুরীলতা সহ পরবর্তী আরও দুটি

কন্যার ও দুটি পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ থেকেও বয়সে বড় এবং ছোট ঠাকুর বাড়ির অনেক মেয়ে বউ নাতনী, এমনকি বিধবারা দেশে বিদেশে নাম-করা স্কুলে কলেজে পড়লেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাননি। বাড়িতেই ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা সহ হাতের কাজের জন্য একাধিক বিদেশি দেশি শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করেছেন। নিজে পড়িয়েছেন। বালিকা স্ত্রী মৃণালিনীকেও তিনি নিয়মিত স্কুলে দেননি। বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে তিনি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক, সংগ্রাহক, অধ্যাপক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সংস্কৃত শেখানোর উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। তার দায়িত্ব নিয়েছেন পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব, যাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ মুগ্ধ করেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যকে' (রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩৭১)। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি এবং নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত থাকলেও জীবনের অধিকাংশ সময়ে যে-সব সামাজিক উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সফল হন বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায়। আলোকিত ঠাকুর পরিবারের সর্বাধিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান বিজ্ঞান এমনকি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তবুও নিজের মেয়েদের এবং মৃণালিনী দেবীকে কেন নিয়মিত স্কুলে যেতে দিলেন না ঠাকুর বাড়ির অন্য ছেলে মেয়ে বউদের মতো তার উত্তর রবীন্দ্রজীবনীকারদের কাছ থেকেও মেলে না। যদিও 'স্ত্রীশিক্ষা' এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়, তবু বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে বলেন্দ্রনাথের বিধবা সাহানা দেবীর (বিবাহপূর্ব নাম সুশীলতা) শিক্ষা বিষয়ক একটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। শাশুড়ি প্রফুল্লময়ী বালিকা বিধবা সাহানাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। স্কুলের পড়া শেষে তিনি টিচার্স ট্রেনিং নেবার জন্যে বিলেতেও গিয়েছিলেন। সাহানা এক সময়ে বিজ্ঞান পড়তে চেয়েছিলেন শান্তি নিকেতনে। চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, কবির কথাতেই তিনি (পিত্রালয় থেকে) চলে এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়, মনে কোনও দ্বিধা না রেখে। কিন্তু এ-সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একেবারেই উৎসাহ না দিয়ে লিখলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে science পড়াইবার সুবিধা আছে বটে কিন্তু laboratory-তে তোমাকে শিক্ষা দিতে গেলে সকলের সামনে তোমাকে বাহির হইতে হইবে—সে কি সম্ভব হইবে ? এ-কথার অর্থ বুঝতে রীতিমত কষ্ট হয়' (ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, পৃষ্ঠা ১৪৬)। রবীন্দ্রনাথের এই লোকসমাজের ভয় দ্বিধার কারণ এও হতে পারে যে, বালিকা সাহানার অকাল বৈধব্য ঘটে গেলে তার পিতা-মাতা এলাহাবাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ে বিধবা সাহানার পুনরায় বিয়ের আয়োজন করছিলেন, হিন্দু ব্রাহ্ম বলে পরিচিত আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান মহর্ষি ঠাকুরবাড়ির বিধবার এই বিয়ে মেনে নিতে পারছিলেন না। দ্বিজেন্দ্র সত্যেন্দ্র জ্যোতিন্দ্র মহর্ষির কথা মান্য করে বিধবার বিয়ে ঠেকাতে যাননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি পিতার কথায় এলাহাবাদ যেয়ে পিতা-মাতা সাহানা দেবীকে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করে বালিকা বিধবা সাহানাকে জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই ঘটনা তখন অনেকেই জানতেন। তাই শান্তি নিকেতনে সাহানা দেবী পড়তে এলে তাকে দেখে মনে পড়বেই যে রবীন্দ্রনাথ বালিকা বিধবা মেয়েটির বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, এই দ্বিধা থেকেই হতে পারে তিনি সাহানা দেবীকে তারই বিদ্যালয়ে লোকের সামনে হাজির করতে চাননি। তবে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে বিদ্যাসাগর পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে প্রবন্ধে যুক্তি তর্ক করেছেন প্রচুর। হয়তো তার পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালী ছিল সম্পূর্ণ তাঁর মতো করে, মেয়েরা কাণ্ট হেগেল পড়লেও শিশুদের স্নেহ এবং পুরুষদের দূরছাই বলে উপেক্ষা করবে না। বিধাতা তাদের হৃদয়প্রাবল্যে কোনো কার্পণ্য রাখেননি। তিনি মনে করেন, 'বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এই খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে' না। 'স্ত্রীশিক্ষা' (বিচিত্রা, পৃষ্ঠা ২২৪) প্রবন্ধে তিনি শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়েদের মেয়ে হইতে ব্যবহারিক শিক্ষার উপর জোর দেন 'তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ-কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে পুরুষে পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে এ-কথা মানিতে দোষ কী ?' রবীন্দ্রনাথ কন্যাদের কেন পুত্রেরও বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষাদানও করেছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্যেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ও উপনিষদ, সাহিত্য পুরাণ পাঠে অধিক মনোযোগী ছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার জন্য তিনি একাধিক শ্বেতাঙ্গ গৃহশিক্ষকও রেখেছেন। আবার তাঁর বিশ্বাস ছিল রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ব্যতিরেকে শিক্ষার সম্পূর্ণতা হয় না' (রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩৯৩)। অন্যদিকে শিক্ষায়তনে পদ্ধতিগত 'বিশুদ্ধ শিক্ষা' এবং বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন প্রয়োজন মনে করেননি তাঁর কন্যাদের জন্য।

বিদ্যালয়ে না গেলেও মাধুরীলতা সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলায় ভালো শিক্ষা লাভ করেছিলেন শুধু নয়, ভালো গল্প ও গদ্যও লিখেছেন প্রচুর। মাধুরীলতার বয়স যখন ১৪-ও হয়নি, মে ১৯০০ সালের কথা, কবির দুই বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মাধুরীলতার সমবয়সী কন্যাদের বিয়ের খবরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আদরের বেলা মাধুরীলতার বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেন , কারণ 'বেলাও খুব মস্ত হয়েছে।' শুরু হয় পাত্র খোঁজা। সেই কালের বিবেচনায় বেলার হয়তো বয়স হয়েছে, কিন্তু কেবল যৌবন প্রারম্ভের এই বয়সে বিয়ের বিপক্ষেই তো তিনি জোরাল বক্তব্য দিয়েছেন কিছু পূর্বে ! বেলার বয়স

বিবেচনা ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির একটি প্রথাও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কাজ করেছে বলে তাঁর সব জীবনীকারই যা মনে করেন তা হলো, 'মহর্ষির জীবদ্দশায় ঠাকুর পরিবারের প্রথানুযায়ী বিয়ের যাবতীয় তাঁদের সরকারি তহবিল থেকেই খরচ মেটানো হত। ... অনুমান, পারিবারিক এই ব্যবস্থার জন্যেই চৌদ্দ পূর্ণ হওয়ার আগেই বেলার বিয়ে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহের জন্যে তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন' (পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৭৩)। নিজের লিখিত মতামত প্রকাশের পর 'ব্যক্তিস্বার্থে' ভূমিকা বিস্মরণে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি প্রকাশ করেন রবীজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল, কারণ 'হিন্দুবিবাহ' 'অকাল বিবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিতর্কে তিনি বাল্যবিবাহরোধে সভাসমিতি, কাগজে কাগজে লেখা বা আইন-প্রণয়নের যৌক্তিকতা স্বীকার না করলেও তাঁর স্পষ্ট সমর্থন ছিল যৌবন বিবাহের প্রতি। সেক্ষেত্রে শ্রীশচন্দ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এমনকি সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদের বিবাহ দিতে ব্যস্ত হলেও তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের পার্থক্য ছিল। কেবল কবি নয়, বাঙালি সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল চিন্তানায়কের। তাই ব্যক্তিস্বার্থে তাঁর সামাজিক ভূমিকা বিস্মরণের ইতিবৃত্তটি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর' (রবীজীবনী ৪র্থ খণ্ড)। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ভূমিকা এবং তার ওপর 'চিন্তানায়ক'-এর দায়ভার চাপানো কি ঠিক ! বাংলার সেরা কবি ব্যক্তিত্বের জীবনীকারের এই অস্বস্তিও খুব স্বস্তিকর নয়। শুধু বয়স তো নয়, তিন কন্যার সম্প্রদানে রবীন্দ্রনাথকে নিঃসঙ্কোচে যৌতুক প্রদান এবং গোত্র বর্ণ মিলাতে যেভাবে ভূমিকা রাখতে হয় তাতেও তাঁর অস্বস্তি হওয়ার কথা। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের কথা কেন, চন্দ্রনাথ বসুর প্রথা বিশ্বাসযুক্ত মতের বিরুদ্ধে উচিৎ জবাব তিনি দেন — অন্যদিকে বারো বছর পূর্ণ হয়নি এমন বালিকা বধূ মৃণালিনী তখন গর্ভবতী হন। এই স্ববিরোধীতাও প্রশান্তবাবু দেখেছেন, তারিখ ঘটনা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অস্বস্তি প্রকাশ করেননি।

হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ মধ্যকুড়ির যুবক, পারিবারিক প্রথা ও গোত্র মিলিয়ে সবে বিয়ে করেছেন দক্ষিণডিহি-ফুলতলা গ্রামের শুকদেবের বংশধর, ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বেণীমাধম রায়চৌধুরীর কন্যা ও প্রথম সন্তান ভবতারিণী বা ফুলি বা বিবাহোত্তর নাম মৃণালিনী দেবীকে, মাথার ওপর প্রখর ব্যক্তিত্ববান পিতা মহর্ষি। পরে, পরিণত বয়সে, যখন মৃণালিনী গত হয়েছেন, মহর্ষিও আর নেই, সময় ১৯২৫ — জার্মান মনীষী কাউন্ট কাইসারলিঙ বর্তমান সভ্য সমাজের বিবাহ ও তৎসংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে একটি গ্রন্থ সম্পাদন প্রয়োজনে ভারতীয় বিবাহ সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ রক্ষা করে আর একটি দীর্ঘপ্রবন্ধ লেখেন, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'। 'প্রবাসী'র ১৩৩২ শ্রাবণ সংখ্যায় বাংলায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অবশ্য তিনি বাংলাতেই প্রথম লিখেছিলেন, কারণ 'কাউন্ট কাইসারলিঙ ভারতীয় বিবাহ সম্বন্ধে আমার কাছে একটা লেখা চেয়েছিলেন। ইংরেজিতে দেরি হবে ভয় করে বাংলায় লিখেচি — পরে তর্জমা করে তাঁকে পাঠাতে হবে' (রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, সমাজচিন্তা, পৃষ্ঠা ২১৮)। ভারতবর্ষীয় বিবাহ প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার, মূল্যবোধ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তাদের ঐতিহ্যগত সামাজিক অবস্থানের ভিতর ভারতীয় বিবাহকে দেখেছেন 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধের মতো নয়, এখানে তাঁর কণ্ঠ দার্শনিক–গভীর, নৈর্ব্যক্তিক এবং কিছু বিমূর্তও। পশ্চাতপটে আছে পশ্চিমা সমাজের বিবাহ ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ইঙ্গিত। প্রচলিত প্রথা সংস্কার ও মূল্যবোধের কথা তিনি এই প্রবন্ধে সংগত কারণেই সমালোচনা করেন না, নিজের মতও আলাদা করে প্রকাশ করেন না, ভারতবর্ষীয় প্রচলিত বিবাহ প্রথাকেই তিনি মহিমান্বিত করেছেন ভারতীয় দর্শনের আলোকে। প্রথা বিশ্বাস সংস্কার বিষয়ে প্রচলের বাইরে তাঁর বক্তব্য না থাকলেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তাদের সামাজিক অবস্থান, ভূমিকা বিষয়ে তাঁর মত বিস্তৃতভাবে পুনরায় লেখেন , এই ধারণাগুলো তিনি 'নারী প্রসঙ্গ' (১৯২৩), 'নারী', 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' (১৯২৪) ইত্যাদি গদ্যেও লিখেছেন। নতুন সময়ে নরনারীর সম্পর্কের পুরনো ধরন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলে বিবাহ প্রথার পুরাতন আধারটির বিকৃতি ঘটে, ফলে ভারতীয় বিবাহের মূলভাব সবকিছুর সঙ্গে মানানসই হতে পারছে না। বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিল রেখে নতুন করে ভাববার কথাও তিনি বলেন একবার 'একদিন ভারতীয় সমাজের যে-আধারের উপরে তার বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাব সকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল আক্ষেপ করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন করে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল করে ভাববার' (ঐ, পৃঃ ২১৩)। নতুন করে অনেকেই ভাবছেন, রবীন্দ্রযুগ থেকেই, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নারীসত্তার ভিতর যে দার্শনিক অন্বয় আবিষ্কার করেছেন তার সঙ্গে বিজ্ঞান আর তার নতুন যুগের মেলানো কঠিন। বিবাহকার্যে নারী পুরুষই অন্যতম প্রধান বিষয়। কাইসারলিঙ সাহেবকে তিনি জানান, 'ভারতীয় বিবাহের বিচার করতে হোলে একথা জানা চাই যে এ-বিবাহে স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বলতে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বলছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘটতে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে' (ঐ, পৃঃ ২১১)। অসাম্য তিনি দেখেন ঠিকই, কিন্তু এ যেন কাম্য, এই অসাম্য ধর্মেরই বর ! এই অসাম্যের অগৌরবকে তিনি মহিমান্বিত করতে চান ধর্মবলে আইডিয়াল স্বামীর কাছে

আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে। ঠিক এরকম বক্তব্যই ভারতবর্ষীয় বিবাহ লিখবার পূর্বে ১৮৮৯ সনে তিনি লিখেছিলেন। সেখানে সত্যযুগের জন্য তারই আক্ষেপ প্রকাশ করতে হয় যখন তিনি দেখেন 'নতুন সময়ে নারীরা পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত , তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, ... অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। ... সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে' (রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে, পত্র)। নারী বা স্ত্রীর এই অধীনতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অনতিক্রম্য 'অবশ্যম্ভাবী অধীনতা।' অর্থাৎ চন্দ্রনাথ বাবুর তুমুল বিরোধীতার পর সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন হলের সভার সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-নির্ভর চিন্তার সঙ্গে শতভাগ একই মতপ্রকাশ করার দুই বছর পর তিনি এই পত্র লেখেন। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে ওই একবার যেমন নতুন করে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার কথা বলছেন, তেমন তিনি তো চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ সমালোচনা-কালীনও বলেছিলেন, বলেছিলেন জোর দিয়ে, নিজে বা কন্যাদের বেলায় তেমন ভাববার প্রয়োজন মনে না করলেও। এখানে জোর অবশ্য নতুন কালের উপর নয়, বরং আক্ষেপ প্রকাশ করেন ভারতীয় বিবাহপ্রথা 'যে আধারের উপর' প্রতিষ্ঠিত ছিল 'সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে'। নতুন কালে পুরুষ ও নারী সত্তাও নতুন কালের ধারণায় গড়া। সভ্যতাসৃষ্টির কাজে এখন নারীর ভূমিকা কোনো নারী এবং পুরুষও মনে করে না স্বল্পপ্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিবাহ ভাবনায়ও ভাবছেন, সভ্যতাসৃষ্টিকালে নারীর এই স্বল্পপ্রয়োজনীয়তার অগৌরব আজও লেগে আছে।' কারণ নারীর প্রকৃতির মধ্যে হৃদয়বৃত্তির যে প্রবলতা তা 'স্বভাবতই চলবার দিকে প্রমুখ নয়, আঁকড়াবার দিকেই তার ঝোঁক। এই জন্যে সুস্থিতির মধ্যে যে সম্পদ, নারী তারই সাধনা করলে সার্থকতা লাভ করবে।' তো 'নতুন কাল বিবেচনার' কথাটি কথার কথাই। এর পক্ষে তাঁর চিন্তা ও যুক্তি বিস্তার করেন না, বরং রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষ্যে পত্র বা পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরিতে প্রকাশিত নারী ভাবনারই পুনরপ্রকাশ করেন। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে তিনি যতটা 'হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধ'-এর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেন, ততটাই ঐক্য স্থাপিত করেন চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের মূলভাবের সঙ্গে।

মাধুরীলতা এবং অন্য কন্যাদের বিয়ে প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র শরৎকুমার পাত্র হিসেবে নির্বাচিত হলেন কবির বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সহযোগিতায়। শরৎকুমার 'প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি ও দর্শন অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে ঈশান-বৃত্তি, হেমন্তকুমার মেডাল ও কেশবচন্দ্র সেন মেডাল' প্রাপ্ত এবং ১৮৯৫-এ 'মেটাল অ্যাণ্ড মর‍্যাল সায়েন্স'-এ এম.এ. অবশ্যই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৮৯৬-এ বি. এল. ডিগ্রির পর মজঃফরপুর আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তো মেধাবী ও সুপ্রতিষ্ঠিত এই পাত্রের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত ও আপোশী হতে হয়। কবি বিহারীলাল অতি ঘনিষ্ঠজন হলেও তাঁর পরিবার থেকে পাত্র-পণ চাওয়া হয় কুড়িহাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ সব cash খোঁজ নিয়ে দেখেন দশহাজার টাকার বেশি কিছুতেই তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন না, তাও হয়তো কিছু টাকা দিতে হবে কিস্তিতে। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন, 'বেলার যৌতুক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। মোটের উপর ১০,০০০ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করতে পারি। সেও কতক নগদ এবং কতক instalment-এ' (পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৩৭৪)। কিন্তু পাত্রপক্ষ সহজে রাজী নয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং কবি বিহারীলাল জামিনদার হয়ে পণের টাকা শেষ পর্যন্ত ১২,০০০ টাকায় সমাধা করেন। কিন্তু বড় গোলমাল বাধে আগেই। পাত্রপক্ষ বিয়ের তিনদিন আগে যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে বললে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষুব্ধ হন রবীন্দ্রনাথের উপর, 'বরকন্যার আশীর্বাদ স্বরূপেই যৌতুক দিতে হয়, কিন্তু বিবাহের পূর্বেই যৌতুক চাহিবার কি কারণ ? আমার প্রতি কি বিশ্বাস নাই ? অপদস্থ-অপ্রস্তুত রবীন্দ্রনাথ কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি' (ঐ)। তবে তিনি হবু জামাতা শরৎকুমারকে তাঁর এই অবস্থার কথা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। এরপর পাত্রপক্ষ নিয়মনীতির বাইরে আরও একটি আব্দার করে বসলে রবীন্দ্রনাথ অসম্মানজনক সেই আব্দার প্রথমে মেটাতে রাজি হন। তা হলো, বিয়ের কন্যা প্রিয় বেলাকে অন্যের বাড়িতে নিয়ে পাত্রপক্ষকে দেখাতে হবে। শিষ্টাচার বহির্ভূত এইধরনের দাবি মেটানো অসম্ভব এবং এতে পরিবারের অপমান হবে বলে মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথকে সতর্ক করে দিলে তিনি সংসার অনভিজ্ঞতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে পরে এই প্রস্তাব বদলাতে পাত্রপক্ষকে অনুরোধ করেন প্রিয়নাথের মাধ্যমে। সব শেষে বিয়ে হয় ১৩০৮ সালের ১ আষাঢ় রাত নয়টার সময়। তবে বিয়ের আগে শরৎকুমারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। উল্লেখ্য, বিয়ের সব খরচই মহর্ষির পারিবারিক তহবিল থেকেই নির্বাহ করা হয়েছিল। শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত শরৎকুমার বা তার পরিবার থেকে একের পর এক রবীন্দ্রনাথের জন্য অসম্মানজনক দাবীদাওয়া করলেও রবীন্দ্রনাথ এমন জামাতা পেয়ে খুব খুশি। বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশ বাবুকে লিখছেন, 'আমার জামাতাটি মনের মত হয়েছে। সাধারণ বাঙালি ছেলের মত নয়। ঋজু স্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র...' (ঐ)। যৌতুক নিয়ে দরাদরি, আগেই টাকা পরিশোধের দাবি, অন্যের বাড়িতে বেলাকে দেখার প্রস্তাব ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রশংসা বা বিনয়ী, দৃঢ়চরিত্র, ঋজু স্বভাবের কথা তিনি বলছেন হয়তো মহৎ হৃদয় আর কবির সারল্যে, এবং যৌতুক প্রদানে তাঁর কোনো দ্বিধাও ছিল না বলে। অন্যদিকে বেলার বয়সও তিনি তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধের মতো চিন্তা করে দেখেননি। পরবর্তী কালে বেলার সাংসারিক জীবনে চরম অশান্তি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎকুমারের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি, শেষে বেলার

অকাল মৃত্যু (১৩২৫) রবীজীবনে উপর্যুপরি শোকের, কষ্টের ও পরম দুঃখের আরও একটি অধ্যায় হয়ে ওঠে।

নাম	জন্ম	বিবাহ	জামাতা	যৌতুক*	মৃত্যু
মৃণালিনী দুই পুত্র তিন কন্যা	১ মার্চ ১৮৭৪	৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩	রবীন্দ্রনাথ	—	২৩ নভেম্বর ১৯০২
মাধুরীলতা নিঃসন্তান	২৫ অক্টোবর ১৮৮৬	১৫ জুন ১৯০১	শরৎকুমার চক্রবর্তী	১২,০০০ টাকা	১৩ মে ১৯১৮
রেণুকা নিঃসন্তান	২৩ জানুয়ারি ১৮৯১	৯ আগস্ট ১৯০১	সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বিলেত প্রবাসের যাবতীয় খরচ	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩
অতসীলতা** এক পুত্র এক কন্যা	১৩ জানুয়ারি ১৮৯৪	৭ জুন ১৯০৭	নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	আমেরিকা প্রবাসে লেখাপড়াসহ যাবতীয় খরচ	১৫ মার্চ ১৯৬৯

* জামাতাদের ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় শিক্ষাকালে এবং দেশে ফেরার পরও রবীন্দ্রনাথ মাসোহারা দিয়েছেন।

** পুত্র, কন্যা এবং বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামী অতসীলতার জীবদ্দশাতেই প্রয়াত হন।

*** রবীজীবনীকার, গবেষক এবং তর্থসংগ্রাহকদের রচনায় জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির তারিখে কিছু অমিল দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তারিখ ব্যবহার করা হলো।

দ্বিতীয় কন্যা এবং তৃতীয় সন্তান রেণুকার জন্ম ১২৯৭, ১১ মাঘ তারিখে কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ তখন জমিদারি দেখতে পূর্ববঙ্গের পতিসর ছিলেন। রেণুকার ডাক নাম রাণী। 'পাঁচ বছরের বড়দিদি মাধুরীলতা ও তিনবছরের বড়দাদা রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শৈশব কাটে' কখনো কলকাতায়, কখনো শিলাইদহে, কখনো জনবিরল শান্তিনিকেতনে। দিদি দাদার মতোই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষকের কাছে রেণুকার শিক্ষা শুরু হয়। স্বভাবে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, অভিমানী, একরোখা, সাজগোজে উদাসীন এবং চুল বাঁধতেও বিরক্ত হতেন রেণুকা। জেঠতুতো দাদা নীতীন্দ্রনাথ রাণীর 'নাদ্দা' একবার জন্মদিনে বিখ্যাত দোকান 'হোয়াইট অ্যাণ্ড হলওয়ে লেড্‌ল' থেকে দামী ফ্রক উপহার দেন রেণুকা বা রাণীকে। রাণীর সে জামা পছন্দ হয় না, লেস ফ্রিল ছিঁড়ে জামাটি গা থেকে খুলে ফেলে দিলে মা মৃণালিনী দেবীও অপ্রস্তুত হয়ে জানতে চান, কেন তুই এসব করলি ? 'আমি এসব ভালোবাসিনে, আমার কষ্ট হয় এসব পরতে, তবু কেন আমাকে জোর করে পরানো হয়' (ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৪)। রবীন্দ্রনাথ মাধুরীলতার বিয়ের একমাস যেতে না যেতেই দশবছরের নাবালিকা রেণুকাকে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ খুব ব্যস্ত—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আলোচনা করছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম-বার্ষিক অধিবেশনে ব্যাকরণ-রচনা প্রসঙ্গে ভাষণ দিয়েছেন, বক্তৃতা করছেন সেই বিধবা বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধের সংগঠক, উদ্যোক্তা বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে। এর মাঝেই দশ বছরের রেণুকার বিয়ের ব্যবস্থা নিয়ে তৎপর হচ্ছেন। অভিমানী একরোখা রেণুকার স্বভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু এই নাবালিকার অভিমানী অবুঝ মন কেন বিয়েতে শান্ত হবে ! বরং তাঁর অভিমান আরও বেড়েছিল , সে-কথার আগে মৃণালিনীর কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি পড়ে নেয়া যাক। বিয়ের পর মাধুরীলতাকে মজঃফরপুর স্বামী শরৎকুমারের গৃহে রেখে এসে পত্নীকে এই চিঠি লিখছেন, '... রাণীও যদি বিবাহ করে দূরে যায় তাহলে ওর ভালোই হবে। অবশ্য প্রথম বছর-দুই আমাদের কাছে থাকবে, কিন্তু তার পরে বয়স হলেই (অর্থাৎ বার বছর বয়সে) ওকে সম্পূর্ণভাবেই দূরে (স্বামীর গৃহে) পাঠান ওর মঙ্গলের জন্যেই দরকার হবে। আমাদের পরিবারের শিক্ষা রুচি অভ্যাস ভাষা ও ভাব অন্য সমস্ত বাঙালি পরিবার থেকে স্বতন্ত্র—সেইজন্যেই বিবাহের পর আমাদের মেয়েদের একটু দূরে যাওয়া বিশেষ দরকার। নইলে নূতন অবস্থার প্রত্যেক ছোটখাট খুঁটিনাটি অল্প অল্প পীড়ন করে, স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরকে শিথিল করে দিতে পারে। রাণীর যেরকম প্রকৃতি, বাপের বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ও শুধরে যাবে ...।' স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সচেতন, স্বামীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা তিনি ভাবছেন না। দশ বারো বছরের একটি বালিকার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত যুবকের সেই সম্পর্ক হওয়ার সুযোগ কোথায় ? বিদ্যাসাগর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করে নানাবিধ বিশেষণে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ও পৌরুষের জয়গান করেছেন সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিয়ের ফলে নানাবিধ দুর্ঘটের কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, 'অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্পবয়সেই স্থবিরদশাপণ্ড হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ-সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে' (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃঃ ৬৮১)। প্রবন্ধের শেষে তিনি শিক্ষিত ভদ্র 'স্বদেশীয়দের' কাছে আবেদন জানান, 'সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান হউন' (ঐ, পৃঃ ৬৮৫)। তো রবীন্দ্রনাথ দশ বছরের বালিকা রাণীকে বিয়ে দেয়ার তৎপরতা বা সে-সময়ে বালক-বালিকাদের এমন অপরিণত বয়সে বিয়ের আয়োজন দেখে দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'নৃশংস' 'নির্দয়' কর্মটি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে যেমন তিনি ভেবেছিলেন, শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে বাল্যবিবাহ-প্রথা বন্ধ হবে, একই প্রভাবে অকল্যাণকর সংস্কারও ঘুচে যাওয়ার কথা, এমনকি

মনুর শ্লোক বর্ণিত তেমন বাণীও লোকে পবিত্র জ্ঞানে গ্রাহ্য করবে না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বিদ্যাসাগরসহ পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বাবু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত শরীরতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ডাঃ কার্পেন্টার বাল্যবিবাহের দোষত্রুটি দেখিয়ে প্রচলিত সামাজিক আচারকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। যৌবনপূর্ব বিবাহের সমর্থক রবীন্দ্রনাথও নন এমন প্রতীতি তাঁর কিছু বক্তব্যের সাপেক্ষে জন্মেও। কিন্তু তিনি বাল্যবিবাহের দোষ মোচনে কার্যকর ভূমিকা পালন না করে শিক্ষার প্রভাবের ওপর ছেড়ে দিতে চান যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার ভয়ে সেই পরিস্থিতি শাস্ত্রের নীতি-নৈতিকতা-সংস্কারের অবর্তমানেও আরও ঘটতে পারে। তাঁর কথিত 'আমাদের বর্তমান সমাজের' 'নূতন সমাজের' অর্থাৎ রবীন্দ্রসমকালীন সময়ে মঙ্গল বিধায় যদি শাস্ত্রের অপ্রয়োজনীয় অমঙ্গল বিধানের নাগপাশ কাটিয়ে ওঠা অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে 'স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত কল্পিত' (বিদ্যাসাগর) বিধানের খাড়ায় বালক বালিকার 'পাণিপীড়নের প্রথা' নির্দয় প্রথা বন্ধ করার জন্য সভাসমিতির আয়োজন, কাগজে লেখা বা প্রয়োজনে আইনের বাধ্যতা সৃষ্টি করা যাবে না কেন ! রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধেই বালবিবাহের অনেক কুফলের উল্লেখ আছে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞের বরাত দিয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পরিবারেই স্ত্রী মৃণালিনীসহ প্রিয়জনের জীবনে ঘটা বিপর্যয়, অনির্বাপিত অকাল শোক কি বয়ে আনেনি ! বহু বছর ব্যাপি দেশি বিদেশি শিক্ষায় আলোকিত, উচ্চমার্গের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য সাধানব্রত রবীন্দ্রনাথের পরিবারেই কি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল, যার প্রভাবে বাল্যবিবাহের দোষ কেটে যাবে ! উল্লেখ্য 'বিদ্যাসাগর চরিত' নামে দু'টি নিবন্ধে যা স্মরণসভার জন্য লিখিত হলেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের অনর্গল প্রশস্তি করলেও তাঁর 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রতিরোধের কর্ম উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন না। অন্যদিকে তিনি 'শিশুস্ত্রীবিবাহ', বাল্য বা শৈশববিবাহের সবসময় নিন্দা করাও সমীচীন মনে করেন না। যদি আগের মতো একান্নবর্তী পরিবারের 'সাংসারিক অবস্থা' এবং আগের মতো 'শিক্ষা' থাকে তবে 'শৈশববিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে এমন তো কোনো কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে এবং একান্নবর্তী পরিবার থাকে তবে শিশুস্ত্রীবিবাহ সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক' (হিন্দুবিবাহ)। আগের মতো যে শিক্ষার কথা 'যদি' শর্তে বলছেন তা তাহলে স্ত্রীশিক্ষা নয়, কারণ শিক্ষাবিহীন শিশু মেয়েটির বিয়ের 'উপযোগিতা'র কথাই বলছেন। 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে এর পরের স্তবকে পুরুষের শিক্ষার কথা তিনি লেখেন।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় শুধু শিক্ষার প্রভাবেই কোনো একটি পুরাতন প্রথা দূর হয়ে যাবে ! কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রভাব সত্য হলেও সমাজের ভিতর থেকে তার লোপ ঘটবে না। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহের দুর্ভোগ এখনো চলছে। বর্তমানকালের সরকার বাধ্য হয়ে আইন সৃষ্টি করে নারী পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ঠিক করে দিয়েছেন যা ডাঃ কার্পেন্টিয়ার-এর বক্তব্যের অনুরূপ। অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়বাবুদের মতো অনেকের মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করে কারণ তাঁরা সামন্ত ছিলেন না, শ্রেণীতে তাঁরা মধ্যবিত্ত হলেও জীবন ও মানব সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দিতে সৃষ্টি হওয়া মানবিক বোধের এবং জ্ঞানের আলোকে বুর্জোয়া ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প চৈতন্যে ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেয়টুকু আত্মস্থ করেছিলেন নিজেদের সামন্ত চরিত্রের পটভূমিতে। সামন্ত ধ্যান ধারণা অনেক ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন রেখেও বুর্জোয়া বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করে গেছেন। সে কারণে ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র গং প্রাচীন ধর্মের সংস্কার থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেও দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ সেভাবে পারেন না।

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন স্ত্রীজাতির ধর্ম। যেমন ছোট বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম। বালিকাবধূর কাছে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত যুবক তো পিতৃতুল্যই হবেন। অর্থাৎ তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষে নিজের অবস্থানকে অন্য প্রবন্ধ বা ব্যক্তিগত জীবনেও সমর্থন করে যাচ্ছেন। রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে 'চিঠি' নিবন্ধে তাঁর মত পড়ে দেখা যাক, 'কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম।'

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের মুদ্রক প্রেমতোষ বসুর ঘটকালিতে মাধুরিলতার বিয়ের মাত্র একমাস চব্বিশ দিন পর ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮ তারিখে এল.এম.এফ. ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বালিকা রেণুকার বিয়ে সম্পন্ন হয় অত্যন্ত অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আজন্ম অভিমানী এই বিয়ের আয়োজনে রেণুকা 'খুশি হননি মোটেই' বলে রবীজীবনীকার (পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়) জানিয়েছিন। বিয়ের যৌতুক বা শর্ত অনুযায়ী সত্যেন্দ্রনাথের বিলেতে যাতায়াতের ও উচ্চশিক্ষার খরচ, মাসোহারাসহ সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের মা'কেও মাসোহারা পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিলেতে ডিগ্রি অসম্পূর্ণ রেখেই বছর দুইয়ের আগে ফিরে এলে ভীষণ অসুস্থ মৃণালিনী দেবী রেণুকার বাসরশয্যার আয়োজন করেন। রেণুকার বয়স তখন ১১ বছর ৮ মাস। আর ডাক্তার জামাতার ডিস্পেন্সারি খোলার জন্য আসবাবপত্র কিনে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, সেই সঙ্গে ১৫০ টাকা মাসোহারাও জুগিয়েছেন। শরৎকুমারের বিলেতবাস কালেও তিনি মাসোহারা পাঠিয়েছেন। বিলেত থেকে অকৃতকার্য হয়ে ফেরা, বাবার আনুকূল্যে সংসারনির্বাহ ইত্যাদি অভিমানী রেণুকার মানসিক অশান্তি আর শারীরিক দুর্বলতা বেড়ে ফুলশয্যার অল্প কিছুদিন পরই মৃত্যুপথযাত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে রোগশয্যায় পড়েন। স্ত্রীর চিকিৎসার মতো রেণুকার বেলাতেও রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি'র ব্যবস্থা করেন। রেণুকাকে রোগশয্যায় রেখে মুণালিনী দেবী মাত্র ২৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

রেণুকার অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ একাধিক জায়গায় বায়ুবদল চিকিৎসাবদল করেও কোনো উন্নতি ঘটাতে পারেন না। দিনে দিনেই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে। এমন বিপন্ন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন তাঁর একান্ত পছন্দের জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ না জানিয়ে পাঞ্জাবে বেড়াতে গেছেন। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হলেও নিরুপায় হয়ে সেই টাকা পাঠিয়েছেনও তাঁকে। এই জামাতাকেই রবীন্দ্রনাথ ৭ পৌষ ১৩০৮ বা ২২ ডিসেম্বর ১৯০১ সালে 'পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থাপিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম' পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ভার দিতে চেয়েছিলেন। এইসব মানসিক অশান্তি রেণুকার অসুস্থতা বিপদজনক করে তোলে, শেষমেষ বহু চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯০৩ ১৪ সেপ্টেম্বর মাত্র ১২ বছর ৭ মাস ২২ দিন বয়সে অভিমানী জেদী রেণুকা চিরবিদায় জানালেন 'ওঁ পিতা নোহ্‌সি' রবীন্দ্রনাথকে, এই পৃথিবীকেও। মৃণালিনীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ভাষ্যমতে রেণুকা পিতা বা বাবার বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাকে আশ্রয় করতে পারেননি। মৃত্যুর সময়, বাবার হাত ধরে 'মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমাকে বলে, বাবা, ওঁ পিতা নোহসি বলো। আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ নিশ্বাস পড়ল। তার জীবনের চরম মুহূর্তে কেন সে পিতা নোহসি স্মরণ করল তার ঠিক মানেটা আমি বুঝতে পারলুম না।' সব মানে, জীবনের কত গূঢ় অর্থ মহা মনিষী হলেই কি সবসময় বোঝা যায় ! দশ বছরের বালিকার কাছে কিভাবে পিতা মাতার আশ্রয় এবং নির্ভরতার পরিবর্তে অচেনা এক ভদ্রলোকের ওপর নির্ভরতা কিভাবে তৈরি হবে এও কি রবীন্দ্রনাথ রেণুকার বিয়ের সময় বুঝতে চেয়েছিলেন ?

অতসীলতা বা মীরা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় কন্যা। ২৯ পৌষ ১৩০০ বা ১৩ জানুয়ারি ১৮৯৪ তারিখে কনিষ্ঠা মীরার জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে। মীরার জীবনও সুখ, আদর ভালোবাসার শৈশব সমাপ্তির আগেই নির্বাপিত হয়ে তাঁকে দুঃখের সাগরে নিয়ে ফেলে। শৈশবে মায়ের অভাব দুই দিদি দাদা এবং পিতা রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। সন্তানদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ বাৎসল্য কিংবদন্তিতুল্য। বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখে যেতেন। দাদা দিদিদের মতো মীরার পড়ালেখার আরম্ভ গৃহশিক্ষকের হাতে। কিন্তু সে আর কতদিন, বেলা এবং রাণীর মতো মীরার বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মীরার বয়স তখন ১১ বছরও হয়নি। পিতা দেবেন্দ্রনাথের বয়স হয়েছে, মহর্ষির জীবদ্দশায় কন্যাকে বিয়ে দিতে পারলে আর্থিক সুবিধা পাবেন। পাত্র খোঁজা অব্যাহত থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর মহর্ষির বর্তমানে বিয়ের ব্যবস্থা হয় না। হয় না কারণ, তিনি তখন অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য 'কোনো পাত্রকে আমি বিলেতে পাঠাতে চাইও না, পারবও না।' মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা চিঠিতে তিনি এ-কথা জানান। নাহলে অনেক পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ তো হয়েই ছিল। যেমন নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের পিতা শঙ্কর পণ্ডিত লাহোরের এক পাত্রের খোঁজ দিয়েছিলেন। বিলেত পাঠাতে রাজি নয় বলে কথা এগোলো না। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন এই মীরা। মীরাকে তিনি ডাকতেন 'ক্ষুদ্র বন্ধু' বলে। ক্ষুদ্র বন্ধুটিকে জগদীশচন্দ্র নিজের পুত্রপ্রতিম ভাগিনেয় ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র অরবিন্দমোহনের ভাবী-বধূ হিসেবে ভেবেছিলেন। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর সঙ্গে রসিকতাও হতো। হঠাৎ করেই রবীন্দ্রনাথ রেণুকার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই বন্ধু জগদীশচন্দ্রের অভিলাষ ইঙ্গিত করে লিখেছেন, 'ভয় নাই তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস করিয়া হস্তান্তর করিব না।' আবার জগদীশচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে জানা যায়, 'আশ্রম বিদ্যালয়েরে প্রথম বিদেশি ছাত্র জাপান থেকে আগত হোরি-কে প্রতিদিন পেয়ালাভরা ফুল উপহার দিয়ে আপন করে নিয়েছেন বালিকা মীরা' (রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৪১৩)।

'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধে অভিজ্ঞতা থেকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, যৌতুক হিসেবে বিলেত পাঠানো একসময় বিরোধিতা করলেও, শেষ পর্যন্ত সেই শর্তেই তিনি রাজী হলেন। মীরা বড়দিদি বেলার কাছে মজঃফরপুর বাসকালেই বরিশালের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বামনদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে ফেলেন। বিয়ের পর আমেরিকা পাঠাবে প্রতিশ্রুতি দিলে নগেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি মতে বিবাহে সম্মত হন। চন্দ্রনাথ বাবুর বিয়ের ব্যাপারে শাস্ত্রের জোরাল সমর্থনের নিন্দা করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন কন্যাকেই তাঁর পরিবার অনুসৃত আদি ব্রাহ্মসমাজের রীতিতেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন, প্রয়োজনে পাত্রপক্ষকে এই শর্তে রাজী করিয়ে নিয়েছেন।

মীরার বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪, জুন ১৯০৭ তারিখে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখছেন, 'আগামী ২৩ জ্যৈষ্ঠ মীরার বিবাহ স্থির। স্থান শান্তিনিকেতন। পাত্র শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ... নগেন্দ্রকে বিবাহের পর আমেরিকায় রথীদের কাছে কৃষিবিদ্যা শিখিতেই পাঠাইব। ফিরিয়া আসিলে রথীন্দ্রের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে পারিবে' (রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৪১২)। ২৩ জ্যৈষ্ঠ বিয়ের আগে ৬ বা ৭ জ্যৈষ্ঠে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নগেন্দ্রনাথকে আদি-ব্রাহ্মসমাজ মতে দীক্ষা দেন। তারপর তাঁকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, 'তোমাকে দীক্ষা দিয়া অবধি আমার মন এই নবজীবন ব্রতের প্রতি আবিষ্ট হইয়া আছে। ... তোমার সংসারের পথে সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত লাভক্ষতি মঙ্গলের পথ প্রদর্শক হইয়া তোমাকে যেন ঈশ্বরের দিকেই লইয়া যায়' (ঐ)। তবে রবীন্দ্রনাথের মন যত আবিষ্ট হোক, ঈশ্বরের দরবারে জামাতার জন্য আশীর্বাদ যতই করুন, জামাতা

নগেন্দ্র এই আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম কতটা মেনে নিলেন, রবীন্দ্রনাথের স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদে তার মনে কতটা মঙ্গল জন্মেছিল তা জানা যায় মাধুরীলতা আর রাজলক্ষ্মী দেবীর যুগ্মভাবে লেখা চিঠিতে, নগেন্দ্রনাথের ডায়েরি থেকে এবং মীরা-নগেন্দ্রনাথের পরিবর্তী সংসার জীবনের ঘটনা প্রবাহে। আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে নগেন্দ্রনাথের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অদ্ভূত কত কৌতুকপূর্ণ আচরণের কথা জানা যায়। 'রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ চিঠিটি এবং আনুষঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করেন। দিদি ও দিদিমা (মাধুরীলতা ও রাজলক্ষ্মী) দীর্ঘ চিঠিতে বিয়ের সকল বিবরণ জানান, লিখছেন '২৩ জ্যৈষ্ঠ শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভমুহূর্তে, শুভযোগে, শুভগোধূলিলগ্নে বিবাহ। শুভলগ্নের কথা পরে, আগে পৈতার কথা শ্রবণ কর ...। সকালবেলায় সকলে বসিয়া ফুলহার রচনা করিতেছি এমত সময় বড় বৌঠান প্রমুখাৎ শুনিলাম শ্রীমান নগেন্দ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজ জন্ম লাভ করিবেন। সেদিন তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন। চেলির যোড় পরিয়া নগ্নপদে সকলকার সহিত মন্দির গমন করিলেন। যতক্ষণ সকল আয়োজন চলিতেছিল এই অসভ্য সাজে লজ্জায় অধোবদন জামাতা মন্দিরের বাহিরে পদচারণা করিতে লাগিলেন। নেটিভদের মত খালি পায়ে থাকতে বোধকরি তখন তাঁহার মাথা কাটা যাইতেছিল। পরে যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ সমাপ্ত হইল। বাবা নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন যাহাতে এ বিষয় নগেন্দ্রের যে সকল কুসংস্কার ছিল সেগুলি দূরীভূত হয়, কিছু বোঝাইতে বাকি রাখেন নাই। নগেন্দ্র কি যে বুঝিল ভগবান জানেন, ফিরিয়া আসিয়াই বাবার স্বহস্তদত্ত পৈতা ফেলিয়া দিল। ... নগেন্দ্র ল্যাজটি আসবার সময় বাড়িতে রেখে এসেছিল বটে, কিন্তু ব্যবহার সঙ্গে এনেছিল কাজে লাফানি ঝাঁপানি করতে কোনরকম কসুর করেনি। ... যেই মাথার টোপর বসাতে যাচ্ছি অমনি হাত থেকে টোপরখানা কেড়ে নিয়ে দুখানা করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। সে-সময় কি বলব রথী, ঠাট্টা নয়, বরের অসভ্যতায় আমাদের পর্য্যন্ত লজ্জাবোধ হয়েছিল।' এই নগেন্দ্রের হাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই মীরাকে সম্প্রদান করলেন। আত্মীয়বর্গের সঙ্গে অসৌজন্য আচরণ ছাড়াও মীরাদেবীর সঙ্গে তার আচরণ ছিল অদ্ভূত, উপহাস তাচ্ছিল্যে ভরা। বাসরঘরের কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর্বে নগেন্দ্রনাথের ব্যবহার বলার মতো, বেলার চিঠি, 'বাসরের যা কাজ ফুলের মালাবদল, আতর মাখানো, পান সন্দেশ খাওয়ানো সে-সবও যেন একটা আজগুবি কাণ্ড হল। মালা বদলে কি আছে জানি না, বর তো সেই পাগলের মতো মালাটা ছুড়ে কোন গতিকে ওর (মীরা) গলায় পরিয়ে দিলে। সন্দেশ খাওয়াবে, তাও মীরার গলা এক হাতে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা দিয়ে ওর মুখ সোজা করে নাকে দিলে না মুখে দিলে তার ঠিক নেই। এসেন্স মীরার গায়ে হুড়হুড় করে খানিক ঢেলে পরে আমাদের গায়ে ঢেলে দিল।'

নগেন্দ্রনাথের এমন অস্বাভাবিক ও অসম্মানজনক আচরণের পিছনে তাঁর মানসিক অশান্তিও ভূমিকা রেখেছিল বলে রবীজীবনীকার প্রশান্ত বাবু মনে করেন। আমেরিকায় শিক্ষা, যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ পাওয়ার বিনিময়ে প্রথাবদ্ধ আদি সমাজের দীক্ষাগ্রহণের শর্তে মীরাকে বিয়ে করার প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পীড়া বোধ করেন, ১৪ সেপ্টেম্বর লেখা ডায়েরিতে তার উল্লেখ আছে। আমেরিকায় যাওয়ার জন্য এই বিয়ের পূর্বে থেকেই তিনি বিভিন্নজনের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে কোথাও কোথাও অপমানিত হচ্ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকে নগেন্দ্রনাথদের ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু ধর্মের অনেক সংস্কারমুক্ত। শ্রেণী বা বর্ণের স্মারক ব্রাহ্মণের পৈতাসহ অনেক আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন। নগেন্দ্রের মতো সতের আঠার বছরের যুবকের কাছে এসব সংস্কার প্রগতিশীলতার লক্ষণ বিবেচনায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। আদিব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাগ্রহণের শর্তে বিবাহে রাজি হওয়ার পর তিনি ডায়েরিতে লিখছেন, ... 'লাভের হিসান গণনা করি নাই বরং ক্ষতিই স্বীকার করিয়াছি। ঐ যে বিবাহপদ্ধতির জন্য আমার মত ও বিশ্বাসকে খাটো করিতে হইয়াছে, যাহা আমি কুসংস্কার ও অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি ইহাই কি এক হিসাবে আমার পক্ষে ক্ষতিকর নয় ?' (ঐ)। তবে নগেন্দ্র'র আচরণ শুধু এই মানসিক দ্বন্দ্বের জন্যই নয়, প্রকৃতই তিনি উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভিত্তিতে দেখেছেন যে নগেন্দ্রনাথের স্বভাব তিনি অনেকটাই বুঝতে পারলেও 'কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবার আগ্রহে তিনি তা উপেক্ষা করেন। নিজের এই অন্যায় সম্পর্কে তিনি ক্রমেই সচেতন হয়েছেন—নগেনের জন্য আমিই দায়ী, এ-কথা ত কোনোদিন আমি ভুলতে পারব না। এই বাক্য তাঁর চিঠিতেই আছে' (রবীজীবনী ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪)।

মীরার প্রতি তাঁর আচরণ ধীরে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত বোধ করছিলেন। মীরার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলাকালেই তিনি নগেন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ চিঠিতে 'হিন্দুপ্রথা' সংস্কার বিষয়ে নিজের মত লেখেন। সিঁদুর না পরায় দেশি মেয়েলিত্বের অভাবে আমাদের মনকে আঘাত দেয়, বলেও তিনি জানান। বরকে বরণ, গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি নগেন্দ্রকে তাঁর মত বলেন, '... এই অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা আমরা দেশের সর্বসাধারণের এবং দেশের প্রাচীনকালের সহিত যুক্ত — এগুলিকে অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিতে আমাদের হৃদয়ে বেদনা বোধ হয়। আমরা ঠিক কিভাবে আমাদের হিন্দুপ্রথাকে দেখি এবং প্রেমের সহিত রাখিতে চাই তাহাই তোমাকে জানাইলাম।' সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য নগেন্দ্র'র 'হিন্দুপ্রথা' বা আদিব্রাহ্ম সমাজে অনুসৃত উক্ত প্রথা সম্পর্কে ধারণা এমনকি নগেন্দ্র'র অন্য ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গিও রবীন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন বলে এ-সব কথা তাঁকে লিখতে হয়, কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি পরে এই নবীন যুবকের র‍্যাডিক্যাল

অবস্থান সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঙ্কট তৈরি করতে পারে। সাধারণ ব্রাহ্ম নগেন্দ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে যে পৈতা ধারণ অনিবার্য তা ধারণ করতে অস্বীকৃত হন। বিবাহসভায় মন্দিরের মধ্যে 'গলদেশে যজ্ঞসূত্র দিবার চেষ্টা করা হইলে তিনি তাহা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন' (ঐ)। মাত্র এই ঘটনাটিই নগেন্দ্রকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। তবুও বুঝতে আরও কিছু বাকি ছিল। রবীন্দ্রনাথ আবারো ভেবেছিলেন, তাঁর ভাবনা মতো কিছু না হতে চাইলেও, ভেবেছিলেন উপযুক্ত চাকরি, আয় উপার্জনের ব্যবস্থা হলে মেয়ে-জামাতার 'মনোমালিন্য' ঘুচবে। রবীন্দ্রনাথের সকল প্রভাব খাটিয়ে উচ্চপদস্থ বন্ধুসহ সরকারের বিভাগেও চাকরির সুপারিশ করেছেন, অনেক চেষ্টাতেও হয় না। বিরক্ত হয়ে নগেন্দ্রকে লেখেন, '... একসময়ের অশ্বিনীবাবুর (বরিশালের বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী) দলে তুমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলে। আমার ত বোধহয় সেইজন্যে গবর্মেণ্টের কাছ থেকে কোনো মতেই তুমি support পাচ্ছ না। তা না হলে নিশ্চয়ই রাস্তা সহজ হত' (ঐ)।

শান্তিনিকেতনে রক্ষিত নগেন্দ্রকে লেখা মীরা দেবীর ১৫টি চিঠির মধ্যে শেষদিকের চিঠিগুলি তিক্ততায় ভরা। নগেন্দ্রনাথের 'আচরণ জীবনযাত্রা পারিবারিক জীবনে ডেকে এনেছে অশান্তি, বিভ্রান্তি। অস্মিতা ও অমিতব্যয়িতা-দুর্দম-স্বভাব' শান্তিভঙ্গের কারণ। বাইরে চাকরি সংস্থানের জন্য প্রবল চেষ্টার আগে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন তাঁর পরিকল্পিত পল্লীসংগঠন, শিক্ষাসংস্কার, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে কৃষির ওপর উচ্চতর পড়ালেখা করিয়ে আনার পর কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে, কিন্তু নগেন্দ্র এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ১৯১২ সালে বিদেশে যাওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের অমিতব্যয়িতায় 'ক্ষুব্ধ' হন। বিদেশে রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানানো হয় নগেন্দ্রনাথের 'ক্ষমতাপ্রিয়তা', 'অহমিকার' কথা। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব থেকে শুরু করে জমিদারি, জোড়াসাঁকো বাড়ি, আদি ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও নিজের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ এবং 'ছিন্নপত্র' প্রকাশেও নগেন্দ্রের ওপর নির্ভর করেছিলেন, দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করেছেন জটিলতা, হয়েছেন ব্যর্থ, এমনকি জোড়াসাঁকো বাড়িতে বসবাসকালীন নগেন্দ্র মাধুরীলতা-শরৎকুমারের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছিলেন। মাধুরীলতা পরে জোড়াসাঁকো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকেন। এবং এই ঘটনায় বড় মেয়ে-জামাতা রবীন্দ্রনাথের ওপর করেন প্রবল অভিমান। নগেন্দ্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের এতকিছুর পরও নির্ভরতা দেখে হয়তো বড় মেয়ে জামাইকে অভিমানী করে তুলেছিল। তাঁর জের তিনি বহন করেছেন মাধুরীর মৃত্যু পর্যন্ত। শরৎকুমার রবীন্দ্রনাথকে করেছেন চূড়ান্ত রকমের অবজ্ঞা, মেয়ে মাধুরীলতাও বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে কুণ্ঠিত ছিলেন, এমনকি নোবেল-উত্তর সম্বর্ধনায় তাঁর সবচেয়ে আদরের মেয়ে বেলা ও শরৎ-এর অনুপস্থিতি তাঁকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছিল, যদিও নগেন্দ্র-মীরা অনুপস্থিত থাকেননি। যাই হোক, পর্যায়ক্রমে স্বামীর ব্যর্থতা, অভব্য আচরণ, অকর্মণ্যতা ও অসহযোগিতা মীরার জন্য অপরিসীম লজ্জা ও মনঃকষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। মীরার মানসিক যন্ত্রণার সবই রবীন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন। আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে মীরার জন্য তাঁর কষ্ট আক্ষেপের কথা আছে, '... ওর (মীরা) জীবনের প্রথম দণ্ড ত আমি ওকে দিয়েচি—ভালো করে না ভেবে না বুঝে আমিই ওর বিয়ে দিয়েছি। যখন দিচ্ছিলুম তখন মনে মনে খুব একটা উদ্বেগ এসেছিল। ... বিয়ের রাত্রে মীরা যখন নাবার ঘরে ঢুকছিল তখন একটা গোখ্‌রো সাপ ফস্ করে ফণা ধরে উঠেছিল—আজ আমার মনে হয় সে সাপ যদি তখনি ওকে কাটতে তাহলে ও পরিত্রাণ পেত' (ঐ)। কতটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলে প্রিয় সন্তানের এমন ভবিতব্য মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারে মানুষ !

রবীন্দ্রনাথের নিরলস চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথকে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা-ফাণ্ডের টাকার 'গুরুপ্রসাদ সিংহ অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করে দায়িত্ব দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার বিভাগটি গড়ে তোলার। এই নিয়োগের ব্যাপারে আশুতোষকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।" এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে দেশ ১৪০৪ শারদীয় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে। এই স্থায়ী ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানেও মীরা-নগেন্দ্র সম্পর্কের কোনো উন্নতি হয়নি। মীরা রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় আলাদাভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুযায়ী নগেন্দ্রকে আবার বিলেতে পড়তে যেতে হলে রবীন্দ্রনাথ বিমান ভাড়া হিসেবে তাকে ৫৮০ টাকা দেন। নগেন্দ্রকে ১৯২৩ সনের এপ্রিলে বিলেত যেতে হয়। অন্যদিকে ১৯২২ বা ২৩ থেকেই রবীন্দ্রনাথ মীরাকে স্বতন্ত্র সংসার পাতায় সাহায্য করতে থাকেন। মীরাদেবীকে লিখছেন 'স্বতন্ত্র গৃহস্থলী করতে তোর কত খরচ লাগবে—মাসে দুশো হলে কি চলবে ? আরো যদি দরকার হয় আমি দেব। ... তুই যাতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্থায়ীভাবে আপন সংসারের ভার নিতে পারিস এই আমার ইচ্ছা, নইলে আমার মন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।' প্রশান্তবাবুর রবীজবনীর ভিত্তিতে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এসব খোঁজ তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি মীরার জন্য তৈরি করেন 'মালঞ্চ' বাড়িটি। জীবনের শেষ পর্যন্ত মীরা এই বাড়িতেই বসবাস করেছেন। নগেন্দ্র বিলেত থেকে ফিরে মীরাকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও মীরার অমতে রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রভাব বিস্তার করেননি। নগেন্দ্র যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি নিয়ে বালিগঞ্জের বিজ্ঞান কলেজের কৃষি বিভাগে যোগ দেন তখন কিছুদিন নগেন্দ্রের সঙ্গে বসবাস করলেও মনের অমিল, নানা আচরণের অত্যাচারে, মীরা বাবার কাছেই বেশি থাকতেন। নগেন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি বুঝিয়ে মীরাকে বালিগঞ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রকে লিখে জানান, 'মীরার সঙ্গে তোমার লেশমাত্র বিচ্ছেদ হয় এ আমার কিছুতেই ইচ্ছাসম্মত নয়, এর দায়িত্বও আমার পক্ষে কঠিন। তবুও আমাকে পরম দুঃখে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে ! এবার মাদ্রাজে যখন দেখলুম মীরা তোমাকে ভয় করে, তোমার হাত থেকে প্রকাশ্য অপমানের সঙ্কোচে একান্ত সঙ্কুচিত হয়, তখন স্পষ্ট দেখতে পেলুম তোমাদের দুজনের প্রকৃতির মূল সুরে মিল

নেই। তোমার অধৈর্য্য অসহিষ্ণুতা, তোমার আত্মসংবরণে অসাধ্যতা, তোমার দুর্দান্ত ক্রোধ এবং আঘাত করবার হিংস্র ইচ্ছা সাংসারিক দিক থেকে আমাকে অনেকসময় কঠিন পীড়া দিয়েছে।'

ইতিমধ্যে মীরা-নগেন্দ্রর এক ছেলে নীতীন্দ্রনাথ, কন্যা নন্দিতার জন্ম হয়েছে। আজন্ম দুঃখী মীরার ছেলে প্রকাশনা শিল্পের কারিগরি জ্ঞানের জন্য জার্মানিতে যান, এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। মেয়ে নন্দিতাও পড়ালেখা শেষ করে কৃষ্ণকৃপালিনীর সঙ্গে দিল্লীতে সুখে সংসার করতে করতে নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করেন। ৭৫ বছর বয়সে কলকাতায় ১৯৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করার আগে মীরার যেমন কেউ আর অবশিষ্ট ছিল না, তেমন, মীরার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বংশের শেষচিহ্ন মহাকালে মিলিয়ে গেল।

মীরা দেবীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের আদালতের মাধ্যমে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্র-মীরা-নগেন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ অনেক চেষ্টা করেছেন এই বিচ্ছেদ এড়াতে, নগেন্দ্র চেয়েছেন মীরাকে নিয়ে সংসার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, যে উদ্যমে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ের জন্য অতি উৎসাহী হয়ে যৌতুক ও নানা শর্ত মেনে মীরাসহ সকলের বিয়ে অনুষ্ঠানে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি মেয়েদের সংসারজীবনে সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস চেষ্টা করে শুধু কষ্টই পেয়েছেন, কাঙ্ক্ষিত সুখ মেয়েদের সংসারে ফেরেনি। শেষ পর্যন্ত মীরার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটনায় মীরার সুখের জন্যেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। নগেন্দ্রর অনুরোধে উল্টা লিখেছেন, ... 'এরকম সম্বন্ধের মধ্যে একটুও জোর খাটানোটা আমি কোনোমতেই উচিৎ মনে করিনে। এমন অবস্থায় তোমাদের নিষ্কৃতি দেবার পক্ষে আমার দ্বারা যা করা সম্ভব আমি তা করতে বাধ্য। কিরকমভাবে চিঠিপত্র দেওয়া দরকার তোমরা পরামর্শ করে আমাকে জানিয়ো' (ঐ)। রবীন্দ্রপরিবারে প্রথম এবং একমাত্র আইনি বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় — মীরা দেবীর ইচ্ছা ও মানুষিক শান্তির জন্য এই সহযোগিতা হলেও।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ভাবনা ... প্রবন্ধে ছেলে রথীন্দ্রনাথের (১৮৮৮-১৯৬১) বিয়ের কথা বিশষ করে এই প্রসঙ্গে বিধবা বিয়ের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই বিষয় ভিন্ন একটি প্রবন্ধ দাবি করলেও কিছু বিষয় অবতারণার অনিবার্যতা এড়ানো যায় না। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯) ঠাকুর বাড়িরই মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন বিনয়িনীর মেয়ে। অপরূপ সুন্দরমুখশ্রীর প্রতিমাকে মৃণালিনী শিশু বয়সেই ছেলে রথীন্দ্রের বউ করে ঘরে আনবার কথা বলেছিলেন। প্রতিমার বাবা মা অন্যরাও তা জ্ঞাত ছিলেন। রথীন্দ্র বিয়ের বয়সে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রতিমার দশ বছর হয়ে গেলে তাঁর বাবা-মা অন্যত্র বিয়ের আয়োজন করেন। রবীন্দ্ররাথ কিশোর পুত্রের বিয়ে আয়োজনে তখন সম্মত ছিলেন না। প্রতিমার ১১ বছর কয়সে গণেন্দ্রনাথের ছোট বোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের কথিত শিক্ষার প্রভাবে বাল্যবিবাহের দোষ কিন্তু কাটছেই না। প্রতিমার মাতৃপিতৃকুল তখন শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষার আলোয় আলোকিত ভারতের সেরা পরিবার। যাই হোক বালিকা প্রতিমার নিয়তি অন্যত্র লেখা ছিল। গঙ্গায় সাঁতার কাটতে যেয়ে বিয়ের দুই মাসের মধ্যে নীলানাথের মৃত্যু হলে বিধবা প্রতিমা ঠাকুরবাড়ি ফিরে আসেন। এর পাঁচ বছর পর রথীন্দ্র আমেরিকা থেকে পাঠ শেষে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত স্ত্রী মৃণালিনীর পছন্দের প্রতিমা দেবীর সঙ্গেই রথীন্দ্রনাথের বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিধবা প্রতিমা ঠাকুরবাড়িই মেয়ে এবং মৃণালিনীর পছন্দের। পুত্রকে বিধবার সঙ্গে বিবাহের আয়োজনে মৃণালিনীর আগ্রহরে বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। পূর্বে সাহানা দেবীর প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। বালিকা বিধবা সাহানার বিয়ের আয়োজন মহর্ষির কথায় রবীন্দ্রনাথ ঘটতে দেননি। সেই অপরাধবোধের থেকেও কি প্রতিমাকে নির্বাচন ! পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস আধ্যাত্মিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র গবেষক সংগ্রাহক অমিতাভ চৌধুরী দ্বারকনাথ ঠাকুরের কীর্তি, প্রতিভা, সাংগঠনিক শক্তি এবং চলমান সামাজিক সংস্কার যেমন সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের সমর্থন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে 'অপ্রকাশিত দ্বারকনাথ' প্রবন্ধে আপশোস করে বলেন, '... এই কীর্তিমান বাঙালি যে কত প্রতিভাধর, কতদিকে তাঁর সাংগঠনিক শক্তি, তা আমরা আজও ভালোভাবে বিচার করিনি। অন্যের কথা বাদ দিই, তাঁর পৌত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পিতামহ সম্পর্কে দুচারটে রসিকতা ছাড়া বিশেষ কিছু বলেননি বা লেখেননি। তিনি সারাজীবন শুধু পিতার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গুণপনার কথা লিখে গেছেন। ... পিতার প্রভাব কবির জীবনে সর্বাধিক' (একত্রে রবীন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৪৭৯)। সর্বাধিক প্রভাববিস্তারি পিতা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেও প্রাচীন হিন্দু সমাজের অনেক সংস্কার বিশ্বাসে অক্ষুণ্ন ছিলেন। একবার বর্জন করেও পুনরায় পৈতা ধারণ করেছিলেন যেমন, তেমন তিনি সংস্কারকদের দলে ভিড়ে বিধবাদের বিবাহরীতি সমর্থন করেননি। তিনি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণদের বিয়ের বিরোধীতা করতেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল রচনারাজির ভিতর বিধবা বিয়ের জোরাল সমর্থন জানিয়ে একটি প্রবন্ধও নেই। এ-প্রসঙ্গে চিঠি নিবন্ধেরও খোঁজ মিলেনি। একটি মাত্র গল্পে (প্রতিবেশিনী) বিধবা বিয়ের প্রসঙ্গ এনে রম্য কাহিনী লিখেছেন, আর 'বঙ্কিমের প্রভাবে' অন্তত দুটি উপন্যাসে (চোখের বালি, নৌকাডুবি) বিধবা বিবাহ দেখিয়ে সংসারের অশান্তির চূড়ান্ত পরিণতির কাহিনী তৈরি করেন। হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে মনুর একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করে তিনে

বিধবা বিবাহের বিপক্ষেই বলেন, লেখেন, 'স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ সংসারযাত্রার সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশ স্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে।' বিশৃঙ্খলা ঘটে যদি সন্তানাদি থাকে। 'সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবা রমণীকে পুরাতন ভর্তৃকুল হইতে নূতন ভর্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানা কারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধাজনক , ... এইজন্য মনু পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন।' বালিকা প্রতিমা দেবী নিঃসন্তান তো বটেই, উপরন্তু পুরাতন ভর্তৃকুল থেকে নতুন ভর্তৃকুলে নিয়ে যাওয়ারও অসুবিধা নেই, শুধু জোড়াসাঁকো বাড়ির ৬ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে বদল। প্রতিমা-রথীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন।

হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধ লেখার চার বছর পর ১২৯৮ সালে তিনি লেখেন 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটি। প্রাচ্যের সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিচ্যের মূলত ইংল্যাণ্ডের সমাজের তুলনা করে প্রাচ্যের গুণগান গাইবার সুযোগ করে নেন বিশেষ করে নারী প্রসঙ্গে। এই প্রবন্ধে তিনি বৈধব্যপীড়িত নারীর ভিতর শান্তি, সৌন্দর্য, সুসামাজিকতা ও উপযোগিতা খুঁজে পান। 'বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। ... গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনাবার সময় থাকে, ...' (প্রাচ্য ও প্রতিচ্য, রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ, পৃঃ ৫৪১)। এমন ভালোবাসার বিধবাকে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিয়ে দিতে চাইবেন কেন ? বিদ্যাসাগর মহাশয়দের সংস্কার বাতিকে তিনি পিতৃ আদর্শ থেকে সরে এসে অংশ নিতে চাননি।

প্রতিমা দেবীর বিয়ে শুধু বিধবার প্রতি বিশেষ দায়বোধ থেকে নয়। এছাড়া রথী-প্রতিমার বিয়েতে প্রতিমাদেবীর বড়মামা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আপোশহীন সহযোগিতা উল্লেখ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের কাকা গিরীন্দ্রনাথের বড়ছেলে গুণেন্দ্রনাথের বড় ছেলে গগনেন্দ্রনাথ প্রতিমার মাতা বিনয়িনী সমাজের ভয়ে কুণ্ঠিত হলে বললেন, 'তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের পিছনে আমি আছি, তোমায় সমাজ ত্যাগ করলে আমিও সমাজ ত্যাগ করব। তাই বলে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না' (ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, পৃঃ ১৪৮)। ছোটমামা বিখ্যাত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই বিয়ে সমর্থন করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'সমর গগনদের সঙ্গে রথীর বিবাহ সম্বন্ধে কথা হল—ওরা এবার খুব সাহস দেখিয়েছে' (ঐ)। গগনেন্দ্রের বিশেষ ভূমিকাতে এই বিয়ে হয়ে যায়। বিধবা বিবাহের ফলে সংসারের বিশৃঙ্খলতা ঘটে বলে যে রবীন্দ্রনাথের একদা বিশ্বাস ছিল মহর্ষির মৃত্যুর পরে রথীর বিয়ের মধ্য দিয়ে সেই ভ্রান্তি হয়তো ঘুচল। প্রতিমাকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুখে ছিলেন। রেণুকার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছায়াময়ীর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ মূল ভূমিকা পালন করেন। সত্যেন্দ্র বিয়ের কয়েক মাস পরে মারা গেলে বিধবা ছায়াময়ীর বিয়ের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল। বিশেষ করে ছায়াময়ীর পিতা সতীন্দ্রমোহন বিধবা বিবাহের সমর্থক তো ছিলেনই এবং পাত্র নলিনীকান্ত সমাজসংস্কারক প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও নবকান্তবাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নলিনীকান্ত নিজেও বিধবাবিবাহের জোরাল সমর্থক ছিলেন। মহর্ষি-মৃত্যুত্তোর (মৃত্যু: ১৯ জানুয়ারি, ১৯০৫) প্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিয়ের কিছু কিছু আয়োজনে ভূমিকা রাখলেও এ-বিষয়ে তিনি কোনো প্রবন্ধ লেখেননি, কিন্তু 'বিদ্যাসাগরচরিত্র' রচনায় বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের একনিষ্ঠতার প্রশংসা করেন বৈকি ॥

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় ও ষষ্ঠখণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৫।
২। ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪১১।
৩। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, সমাজচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৩৯২।
৪। বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১, তুলিকলম, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪।
৫। রবীন্দ্রজীবনকথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৭।
৬। রবীজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড।
৭। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, ২০০৭।
৮। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, চিত্রা দেব, আনন্দ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬।
৯। একত্রে রবীন্দ্রনাথ, অমিতাভ চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৩।
১০। বিচিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, অল্পকথা, ঢাকা, ১৩৯৯।

saadkamali@email.com